Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 328 – 337
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ভূগোল, আদি-মধ্যকালীন বঙ্গ : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা

আফতাব মনসুর
এম.ফিল, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : aftabmansur.polta@gmail.com

Keyword
বৌদ্ধধর্ম, সাংস্কৃতিক ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন ভূ-ভাগ, নবীন ভূ-ভাগ, ব-দ্বীপ, পুন্দ্র-বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ-বঙ্গাল ও সমতট-হরিকেল।

Abstract
ইতিহসের পটভূমিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানব ভূগোলের একটি জটিল সংমিশ্রণ আর এই সংমিশ্রণকেই একটি নির্দিষ্ট ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াসই এই নিবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়। আর ধর্মের উপস্থিতি সেই ভৌগোলিক অবস্থান কে এক নতুন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষাপটের জন্ম দেয়, যেখানে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বীজ নিহিত থাকে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি প্রাচীন বঙ্গের ভূগোলকে এক নতুন পরিমণ্ডল প্রদান করেছে। যেমন কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নামহীন বা অপরিচিত থাকলেও সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে সেই ভূভাগ শুধুমাত্র আঞ্চলিক স্তরেই নয় বৃহৎ ভৌগোলিক স্তরেও পরিচয়ও লাভ করে। যেমন- বোধগয়া ও নালন্দা বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমি হওয়ার পূর্বে নামগন্ধহীন স্থান ছিল বা তার ভৌগোলিক অস্তিত্বের কথা এক সময় অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় স্থান দুটি শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাবে নয় বরং বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং নিজ দেশের বাহিরেও ধর্মীয় ও ভৌগোলিক পরিচিতি পেতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল, মানব ভূগোল ও ধর্মীয় ভূগোলের জটিল অথচ পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরার প্রয়াস করাই এই গবেষণামূলক নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

Discussion
সাধারণত সাংস্কৃতিক ভুমি বলতে বোঝাই নির্দিষ্ট সময় বা যুগের একটি সংস্কৃতির একই বা ভিন্ন ধরণের বিস্তৃতিকে যেটি তার নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে (ভৌগোলিক অঞ্চলে) কীভাবে Develop or Conceive করছে সেই বিষয়কে। প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষায় বলা যায় সাংস্কৃতিক ভূমি বলতে বোঝায় Material Culture of a Space যেখানে যুগ যুগ ধরে একটি সংস্কৃতি তার সতন্ত্র বৈশিষ্টের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলকে প্রভাবিত করছে এবং হয়ত এখনও করে চলেছে। সেক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে

সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সাধিত হতে পারে আবার সেই সংস্কৃতি তার ভৌগোলিক পরিধি অতিক্রম (Continent change) করতেও পারে। অর্থাৎ সহজ কথায় সাংস্কৃতিক ভূমি বলতে বোঝাই সেই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে যেটি বিশেষ ভাবে বা বিশেষ অর্থে সেই অঞ্চলের স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন এবং কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যেমন- দেবালয় ও বৌদ্ধবিহারগুলি। আর এই নিবন্ধে মূলত বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কে দেখা হবে। আর এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে বৌদ্ধধর্ম এবং ভূভাগ বলতে আদি-মধ্যকালীন বাংলার আলোচনা করা হবে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভূ-ভাগ গৌতমবুদ্ধের আলোকছটায় আলোকিত এবং বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমি বলে পরিচিত। যদিও গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং উক্ত ভৌগোলিক ভূখণ্ডের সমস্ত অঞ্চলে স্বশরীরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেননি তৎসত্ত্বেও তাঁর নির্বাণ লাভের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র পূর্ব ভারতেই বৌদ্ধধর্ম সুপরিচিত হয়ে ওঠে এবং সুদীর্ঘ কাল নিজ ধর্মীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে,

> "বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি পূর্ব ভারত, পূর্ব ভারতেই ইহা বিকশিত হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় একমাত্র পূর্ব ভারতেই দীর্ঘস্থায়ী হয়।"[১]

তবে অবশ্যই পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের এরূপ বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের পিছনে অনার্য সংস্কৃতির উপস্থিতি এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নীবির ও কঠোর পরিশ্রম ছিল অন্যতম একটি প্রধান কারণ এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক পৃষ্টপোষকতাও অন্যতম একটি কারণ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের ধম্মনীতির ফলে আংশিক ভাবে হলেও পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে (পুণ্ড্রবর্ধন ও রাঢ় অঞ্চলে) বৌদ্ধ সংস্কৃতি পরিচিতি পেতে শুরু করে। গুপ্তাব্দের সূচনা হলে গুপ্ত শাসনের অধিনে থাকা পূর্ব ও মধ্য ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বৌদ্ধধর্ম ক্রমে পূর্বে প্রসারিত হতে থাকে এবং পাল শাসনাকালে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা পেয়ে তার চূড়ান্তর পরিণতি লাভ করে এবং পাল শাসনাকালেই বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পরে যার প্রামান আমরা দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে জানতে পারি। পূর্ব ভারতেরই একাধিক পণ্ডিতবর্গ (যেমন- অতীশদীপঙ্কর,শীলভদ্র) তাদের কঠোর পরিশ্রম ও অগাধ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধধর্মকে নিজ দেশে ও বহির্দেশে শ্রদ্ধেয় এবং প্রশংসিত করে তুলতে সার্থক প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, চিন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরে প্রসার লাভ করেছিল। এছাড়াও বাংলার মূল ভূখণ্ডে ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক যেমন দেব, খড়্গ, রাত ও চন্দ্রদের সময়ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। বিভিন্ন শতাব্দীতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধবিহার নির্মাণ হতে থাকে পূর্ব ভারতে, যেগুলি বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠতে শুরু করে, যেখানে ভারত তথা বহির্বিশ্বের পণ্ডিতবর্গ জ্ঞ্যানার্জনের জন্য আগমন করতে থাকেন। বহু শতাব্দী থেকেই পূর্ব ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন এবং অনেক ক্ষেত্রই তাদেরকে বৌদ্ধবিহারগুলিকে জমিদান ও অর্থনৈতিক সাহায্য করতে দেখা যায়, যদিও তারা তাদের রাজনৈতিক কতৃত্ব কায়েম করার জন্য এরূপ সাহায্য করে থাকবেন তাতে বিস্ময় হওয়ার কিছু নেই। আদি-মধ্যযুগিয় বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঞ্চলগুলির যথা-পুন্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ-বঙ্গাল এবং সমতট-হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বিকাশের প্রকৃত অবস্থা জানতে হলে সর্বাগ্রে উক্ত অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থা জানতে হবে, আর এই জানার প্রচেষ্টা প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে করা হবে। এই গবেষণামূলক নিবন্ধে বৌদ্ধধর্মের ভূগোল বলতে মূলত সেইসমস্থ অঞ্চলকে বোঝান হয়েছে যেসমস্ত অঞ্চলগুলিতে বর্তমানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্নাবশেষ আজও দৃশ্যমান বা বিভিন্ন সাহিত্যি ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মাধ্যমে অনুমিত হয় যে পূর্বে বৌদ্ধবসতির উপস্থিতি ছিল সেই সমস্ত স্থান বা অঞ্চল গুলিকে। আদি-মধ্যযুগিয় বাংলার মানুষের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শেখর অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলার বস্তগত ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ এবং প্রাচীন জনপদ সমূহের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে তবেই উক্ত অঞ্চলগুলির স্থানীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির সম্পর্কে বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তুলে ধরা সম্ভব হবে।

Research question : কিছু নির্বাচিত পুস্তক, জার্নাল এবং নিবন্ধের সাহিত্যিক পর্যালোচনা করে নির্বাচিত গবেষণা বিষয়ের পূর্বের কাজগুলির অধ্যায়ন করে জানা সম্ভবপর হয়েছে যে, পূর্বে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের উপর প্রচুর গবেষণা হলেও স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে সেভাবে কোনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়নি। প্রস্তাবিত এই গবেষণায় আদি-মধ্যকালীন বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসর বা বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক ভূমির উপর আলোকপাত করার প্রয়াস করা হবে।

Research Methodology : প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের প্রাচুর্যতাপূর্ণ অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে। এই গবেষণার ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমি বোঝার জন্য বেশিরভাগ তথ্যই প্রাথমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদনগুলি এই গবেষণার প্রাথমিক বা মুখ্য উৎস। আবার এই গবেষণার গৌণ উৎসগুলির মধ্যে একাধিক পাঠ্য যেমন-পুস্তক, জার্নাল, নিবন্ধ, এবং অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদানও উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণাটি Empirical Investigation (combination of both the Qualitative and Quantitative analysis) এর উপর ভিত্তি করে অধ্যায়ন করা হবে। যেখানে প্রাথমিক উৎসগুলি সংগ্রহ করা হবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র, জাদুঘর এবং বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে Transect Survey and Field Work এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে Participation Observation technique বিশেষত Interview-Schedule অনুসরণ করা হবে। কেননা নমুনার আকার অনেক বড় এবং সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করতে Interview-Schedule একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই অধ্যায়ন সম্পর্কে মৌলিক বিবরণ পেতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্বে যারা কাজ করেছেন তাদের এবং সেই অঞ্চলের স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে Cartographical Maps, Toposheet, Satellite Images, Photos ইত্যাদি এর সাহায্য নেওয়া হবে গবেষণাটির সঠিক ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য।

একটি ভূ-খণ্ড বা অঞ্চলের যথাযথ ইতিহাস পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে 'বাংলা' ভূ-খণ্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা সবসময়ই ছিল এবং ভৌগোলিকগনও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাকে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করে থাকেন তার অবস্থানগত কারণ, ভূ-প্রাকৃতিক বিন্যাস এবং জলবায়ুর কারণে। এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, আদি-মধ্যযুগিয় বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, তাদের ধর্মীয় জীবনের বৈচিত্র্যে, শিল্পের স্বাতন্ত্র্যে, বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধতায়, সর্বোপরি 'বাংলার ব্যক্তিত্ব' গঠনে এ অঞ্চলের ভূগোলই পালন করেছে প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা।

বাংলার ইতিহাস ও কৃষ্টি সৃষ্টিতে ভূগোলের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা একাধিক পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেছেন। অমিতাভ ভট্টাচার্য, নিহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, আকসাদুল আলম, বি. এম. মরিসন, কাননগোপাল বাগচী, আব্দুল মোমিন চৌধুরী, হারুনুর রসীদ, দিলীপকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ ভূগোল কে বাংলার ইতিহাস সৃষ্টির এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দর্শিয়েছেন। এবং তাঁদের দ্বারা লিখিত তথ্য এই নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যথাপোযুক্ত তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছে। আব্দুলমোমিন চৌধুরীর মতে, প্রাচীন বাংলার ব্যক্তিত্ব গঠনে অর্থাৎ বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির চরিত্র নির্ধারণে এ অঞ্চলের অবস্থানগত প্রভাব অর্থাৎ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্টগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।[২]

ঐতিহাসিক এ. এইচ. দানীও বাংলার শিল্পের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করতে গিয়ে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন এ অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব, ভূগোল, জলবায়ু, নদ-নদী ইত্যাদির উপর।[৩] দক্ষিণ বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ড. হারুনুর রশীদ বলেন বাংলার ইতিহাস গঠনে এবং দেশ ও জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে ভূগোল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।[৪] অমিতাভ ভট্টাচার্য তার বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল নামক গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার ভূগোল যুগ যুগ ধরে কীভাবে দেশের (বাংলার) মানুষের ইতিহাস ও চরিত্রকে প্রভাবিত ও গড়ে তুলেছে।[৫] অর্থাৎ উক্ত পণ্ডিতবর্গের মতানুসারে একথা পরিস্কার যে যেকোনো স্থানের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে উক্ত অঞ্চলের ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই এই গবেষণার আলোচিত

বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রবিন্দুগুলির ভূগোল তুলে ধরার আগে সেই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক পরিচয়, নদ-নদী এবং জলবায়ুগত অবস্থানও একইসঙ্গে তুলে ধরা হবে যাতে এই গবেষণার যথার্থতা প্রকাশ পায়।

আদি-মধ্যযুগীয় বাংলাকে বুঝতে হলে শুধুমাত্র আজকের পশ্চিমবঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশকে পৃথকভাবে না বুঝে বরং বিংশ শতকের পূর্বের বৃহৎ-বাংলার ভৌগোলিক সত্ত্বা কে বুঝতে হবে। কেননা তৎপুর্ববর্তী বৃটিশ বাংলা এবং আদি-মধ্যযুগীয় বাংলার ভৌগোলিক সত্ত্বা মোটামুটি একইরকম ছিল। যা প্রায় ৮০০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবিধৌত পলিগঠিত এক বিশাল অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন বি.এম. মরিসন।[৬] যার পূর্বে ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপালের তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে ছোটনাগপুর-রাজমহল পাহাড়ী অঞ্চল এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এই বঙ্গভূমিকে বৃত্তের মত আবদ্ধ করে রেখেছে।

ঐতিহ্যময় ও বৈচিত্র্যময় এই বঙ্গীয় ভূ-ভাগকে ভূতাত্ত্বিক ভাবে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা হয়ে থাকে এবং এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত এই তিনটি ভাগকে গুরুত্ব দিয়েই বৌদ্ধধর্মের ভূগোল দর্শানর চেষ্টা করা হবে। এই তিনটি ভূ-ভাগ হল- ১) পুরাতন সমভূমি বা পুরা ভূভাগ, ২) অপেক্ষাকৃত নতুন সমভূমি বা নবীন ভূভাগ এবং ৩) ব-দ্বীপ অঞ্চল, যার দ্বারা সমগ্র বাংলা ভৌগোলিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ। উক্ত তিনটি ভৌগোলিক ভূভাগের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভূভাগে অবস্থিত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরা হবে বর্ণিত অধ্যায়ের যথার্ততা প্রকাশের জন্য এবং নিম্ন উল্লেখিত একটি ছকের মাধ্যমে এই ধারণা পরিষ্কার ভাবে চিত্রায়িত করা যেতে পারে-

আদি-মধ্যযুগীয় বাংলার ভূতাত্ত্বিক-*ভৌগোলিক অঞ্চল*	*পুরাতনভূমি*	*অপেক্ষাকৃত নবীন সমভূমি*	*বদ্বীপ*
আদি-মধ্যযুগীয় বাংলার *রাজনৈতিক অঞ্চল*	পুণ্ড্র-বরেন্দ্র, রাঢ়	বরেন্দ্রের মধ্যবর্তী ভূভাগ, শ্রীহট্ট-কুমিল্লা	ব্যাঘ্রতটিমন্ডল, খারিমন্ডল, নব্যবকাসিকা ও সমতট
আদি-মধ্যযুগীয় বাংলার *বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতি অঞ্চল বা কেন্দ্র*	মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর জগজীবনপুর, বাণগড় রাজবাড়ীডাঙ্গা, ভরতপুর, তাম্রলিপ্ত ও মোগলমারী	লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের বৌদ্ধবিহার (রূপবান মুড়া, আনন্দ বিহার, কুটিলা মুড়া ইত্যাদি)	চন্দ্রকেতুগড় ও কঙ্কনদীঘি

১) পুরাতন বা প্রবীণ ভূ-ভাগ :

বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডের বেশকিছু ভূ-ভাগ যেমন- দক্ষিণপশ্চিম ভাগ, উত্তর ও উত্তরপূর্বাংশের কিছুটা অঞ্চল পুরাতন বা প্রবীণ ভূ-ভাগ পরিলক্ষিত হয়। যা আজ থেকে আনুমানিক ৬-৭ কোটি বছর পূর্বে টারশিয়ারি যুগে সৃষ্টি হয়। এই ভূভাগেই প্রাচীন রাঢ় (দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর অঞ্চল) ও কুমিল্লা-শ্রীহট্টের (উত্তরপূর্ব অঞ্চল) মত অঞ্চল অবস্থিত যাদের ভৌগোলিক সত্ত্বার অনুসন্ধান করলে উঠে আসে এক সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। তবে আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই উত্তর ও উত্তরপূর্বাংশ এর পুরাভূভাগের আলোচনা আগে করা হবে এবং তারপর দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলটির সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে কেননা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলটি সতন্ত্র ব্যাখার দাবি রাখে।

সুগঠিত প্রবীণ ভূ-ভাগের এই শাখাটি রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পেরিয়ে উত্তরবাংলা জুড়ে অবস্থিত। বীরভূম-মুর্শিদাবাদের মতোই এখানকার মাটি লাল, স্থূল বালুময়। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মালদাহ ও দুই দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরও এই প্রবীণ ভূ-ভাগেরই অংশ। উত্তর বাংলায় এই পুরাভূমির একটি অংশ অপরাংশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। বগুড়া, উত্তর রাজশাহী, পূর্ব দিনাজপুর আর রংপুরের পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত কিছুটা

উঁচু যে অঞ্চলটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ও আদি-মধ্যযুগিয় বরেন্দ্র বা বারিন্দ অঞ্চল বলে সুবেদিত। এই অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র অবস্থিত ছিল এবং সেই সঙ্গে সেখানে একাধিক বৌদ্ধবসতি গড়ে উঠেছিল যার প্রামান আমরা পেয়ে থাকি একাধিক সাহিত্য, লিপিমালা, ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণে পেয়ে থাকি।

এই পুরাতন ভূভাগে অবস্থিত অন্যতম এক প্রাচীন জনপদ হল পুণ্ড্রবর্ধন যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক পরিসীমা, ধর্মীয় গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। পুন্ড্র আদতে একটি প্রাচীন জনজাতির নাম। নামটি প্রাচীন জনজাতি থেকে উৎপত্তি হলেও ধীরে ধীরে একটি আঞ্চলিক স্বত্বায় অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুন্ড্র নামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে পায় যেখানে অন্ধ্র,শবর, পুলিন্দ এবং মুতিবদের সঙ্গে পুন্ড্রদের প্রান্তীয় জনজাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক প্রাচীন সাহিত্য যথা বোধায়ন-ধর্মসুত্রে পুন্ড্রদের আর্যভুমির প্রাচ্যে-প্রান্তদেশিয় দস্যু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাঙ্খ্যায়ন স্রৌত, হরিবংশ, জৈনকল্পসুত্র এবং রামায়ণেও পুণ্ড্রদের জাতি সত্ত্বার উল্লেখ পায়। তবে পুণ্ড্রবর্ধনের আঞ্চলিক সত্ত্বার প্রাচীন পরিচয় সম্পর্কে একটি সম্ভব্য অনুমান পাওয়া যায় মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে, যেখানে উল্লেখ আছে যে ভীম মুদগগিরির রাজাকে নিহত করে প্রভাবসশালী জনৈক কোশীকি-কাচ্ছারের এক ভুপালক ও পুণ্ড্ররাজ কে পরাভূত করে বঙ্গ আক্রমণ করেন। ভূতাত্ত্বিকদের মতে কোশীকি-কাচ্ছা ছিল কোশী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আর এই কোশী নদী একদা উত্তরবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হত। অর্থাৎ একথা বললে বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না যে কোশী নদীই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পশ্চিমতম সীমানা।

প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের পরিচয় বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর ডান তীরে অবস্থিত মহাস্থানের সাথে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে সেখানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপির আবিষ্কারের জন্য। লিপি বিশারদদের মতে যা কিনা খুব সম্ভবত মৌর্য যুগের। পুণ্ড্রনগর ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিকভবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যা দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তার মহিমা বজায় রাখতে সার্থক হয়েছিল। এই পুন্ড্রনগরীই পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়ে গুপ্ত শাসনাধীনে একটি ভুক্তিতে পরিণত হয়। ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম্রপট্টে এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণে এই পুণ্ড্রবর্ধনের নাম পাওয়া যায়। উপরিউক্ত তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তদানিন্তন পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তত বগুরা-দিনাজপুর-রাজশাহি জেলা অর্থাৎ সমগ্র উত্তরবঙ্গই এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। তবে দক্ষিণের সীমানা বিভিন্ন রাজবংশের শাসনাকালে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ কজঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সেখান থেকে করতোয়া পার করে কামরূপে গিয়েছিলেন বলে তার ভ্রমন বৃতান্তে উল্লেখ করেছেন। আর হিউয়েন সাঙ্গ বর্ণিত কজঙ্গল বর্তমান রাজমহল অঞ্চলেকে নির্দেশ করে। সুতরং ভৌগোলিক ভাবে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী তীর থেকে একেবারে করতোয়া পর্যন্ত অঞ্চলই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন। ঐতিহাসিক নিহাররঞ্জন রায়ও উক্ত মত কেই মান্যতা দিয়ে উল্লেখ করেছেন, কজঙ্গল এবং করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগই হল পুণ্ড্রবর্ধন।

পরবর্তীকালে পৌন্ড্রভুক্তি বা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির রাষ্ট্রসীমা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে যার প্রমাণ একাধিক সাহিত্য এবং লিপিমাল থেকে পায়। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে ব্যাঘ্রতটীমন্ডলের উল্লেখ পায় যাকে পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] এই ব্যাঘ্রতটীমন্ডল খুব সম্ভবত দক্ষিণের ব্যাঘ্র অধ্যুষিত বনময় প্রদেশ যা বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়। সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ সীমা খাড়িবিষয় বা খাড়িমন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যা ভৌগোলিক ভাবে বর্তমান ২৪ পরগণা ও বাখরগঞ্জ কে নির্দেশ করে। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি লিপিতেও খারিমন্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায় যা কিনা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিরই অন্তর্গত, আর এই খারিমন্ডল বর্তমান বদ্বীপ ভূভাগের তটিয় অঞ্চলকে (খুব সম্ভবত দক্ষিণ ২৪ পরগণাকে) নির্দেশ করে। অর্থাৎ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রাজবংশের সময় পুণ্ড্রবর্ধনের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানা প্রসারিত হয়েছে এবং অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন গঙ্গা পেড়িয়ে ভাগীরথী ও পদ্মা মধ্যবর্তী ভূভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয় যার প্রমাণ উক্ত তথ্যগুলি থেকে পায়।

পুণ্ড্রবর্ধনের আর একটি ভৌগোলিক উপবিভাগের নাম হল বরেন্দ্রি বা বরেন্দ্র। যার ঐতিহাসিক উল্লেখ আনুমানিক দশম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সাহিত্য এবং লিপিমালা তে পায়। কামরূপরাজ জয়পালের সেলিমপুর লিপিতে বরেন্দ্রি পুন্ড্রর অন্তর্ভুক্ত বলেই জানা যায়। বৈদ্যদেবের কমৌলী লিপিতে বরেন্দ্রির উল্লেখ পায়।[৮] লক্ষণসেনের তর্পনদীঘি লেখে বরেন্দ্রিকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] লক্ষণসেনের মাধাইনগর লিপিতে[১০] দাপনিয়াপাটক গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় যার অবস্থান বরেন্দ্রির কান্তাপুরে বলে লিপিতে উল্লেখিত সেটি বর্তমান দিনাজপুরেরে কান্তাপুরের সঙ্গে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও অন্য একটি লিপিতে নাতারি গ্রাম কে বরেন্দ্রির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্তমান রাজশাহী জেলার নাতোর বলে প্রমাণিত। সুতরং উভয় লিপি থেকেই প্রমাণিত যে বরেন্দ্রি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত। অর্থাৎ বরেন্দ্রি যে বর্তমান রাজশাহী ও দিনাজপুর সংলগ্ন অঞ্চল তা পুরপুরি ভাবেই পরিষ্কার। কবি সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রিকে পালরাজাদের জনকভু অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে উল্লেখ করেছেন এবং বরান্দ্রির অবস্থান গঙ্গা (বর্তমান পদ্মা) ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগ কে নির্দেশ করেছেন।

সন্ধ্যাকরনন্দী উল্লেখ করেছেন বরেন্দ্রির দক্ষিণদিক গঙ্গা দ্বারা বিধৌত ছিল এবং রামপাল এই নদী অতিক্রম করে বরেন্দ্রিতে প্রবেশ করেছিলেন। অর্থাৎ সন্ধ্যাকরনন্দীর বরেন্দ্রিও পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলকেই ইঙ্গিত করছে যা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে সেনরাজাদের বিভিন্ন লিপিতেও বরেন্দ্রিকে পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ পায়, যথা বল্লালসেনের বল্লালচরিতে বরেন্দ্রিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ পায়। মধ্যযুগিয় ইসলামিক গ্রন্থ তাবাকাত-ই-নাসিরি তে বরেন্দ্রকে লক্ষনৌতির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ উপরিক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে বরেন্দ্রি বা বরেন্দ্র গঙ্গার উত্তরাংশের করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভাবা নদী বিধৌত ভূভাগ যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও দুই দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সঙ্গে চিহ্নিত। যা বিভিন্ন রাজবংশের সময় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনায় পুণ্ড্রবর্ধনের আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হল সুতরং এবার উক্ত অঞ্চলে অবস্থিত একাধিক বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির সম্পর্কে উল্লেখ করা একান্তই জরুরী, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনকে এক বিশাল বৌদ্ধ সংস্কৃতির আঞ্চলিক স্বত্বার অধিকারী করেতুলেছে। পুরাভুমির অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রি অঞ্চলে একাধিক উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সেই প্রাচীন কাল থেকেই। যা থেকে অনুমান করতে সমস্যা হয় না যে, উক্ত ভূভাগটিও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছিল।
পুণ্ড্রবর্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে পুদনগল বা পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ পায় যা মৌর্য সমসাময়িক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।[১১] মহাস্থানগড় একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র যা প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী বলে প্রমাণিত। এখানে এক বিশালাকৃতির প্রত্নাবশেষে পাওয়া গিয়েছে যা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বৌদ্ধবিহার বলে প্রমাণিত। প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের পরিচয় বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর ডান তীরে অবস্থিত মহাস্থানের সাথে নিশ্চিত করা হয়েছে সেখানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপির (মহাস্থানগড় লিপি) আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের জন্য। গুপ্তদের সময় পুণ্ড্রবর্ধন একটি প্রশাসনিক ভুক্তি ছিল যদিও এইসময় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ভৌগোলিক ভাবে উত্তরবঙ্গেই সীমিত ছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের একাধিক লিপিমালাতে এই ভুক্তির পরিচয় মেলে। এই সমসস্ত লিপিমালা থেকে প্রাচীন কোটিবর্ষ বিষয়ের পরিচয় পায় যা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত।[11] হেমচন্দ্র এই কোটিবর্ষকেই একাধিক নামে চিহ্নিত করেছেন যথা- দেবিকোট, উমাবন, বাণগড়, শোনিতপুর ইত্যাদি নামে যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরে অবস্থিত, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে এখানে এক বিশাল বৌদ্ধবিহারের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।[১২] ধনাইদাহ লিপিমালা থেকে খাড়াপারা বিষয়ের উল্লেখ পায় যা বর্তমান রাজশাহীর নাটোরের সঙ্গে তুলনীয় যা আদতে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত।[১৩] পাহাড়পুর লিপি থেকে নাগিরট্ট-মন্ডল ও দক্ষিণমশক-বিথি এর উল্লেখ পায় যা করতোয়া সংলগ্ন বগুড়া অঞ্চলকে নির্দেশিত করে। এটিও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিরই অন্তর্গত ছিল।[১৪] বর্তমান রাজশাহীর (বাংলাদেশ) পাহাড়পুর একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থান যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এক বিশাল বৌদ্ধবিহারের অবশেষ এবং লিপিমালা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জগদ্দল পাল রাজত্বকালে নির্মিত অন্যতম একটি বৌদ্ধ বিহার যেটি বর্তমান বাংলাদেশের ধামুইরহাট (নওগাঁও জেলা) উপজিলার

কোত্রা নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদার হাবিবিপুরে অবস্থিত জগজীবনপুর মহাবিহারও বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ভুমির উজ্বলতম নিদর্শন।

শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চল, ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চল, ভাওয়াল গড়, ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল উত্তরপূর্ব পুরাভূমির অন্তর্গত। যদিও হিউয়েন সাঙ ও ইৎসির বর্ণনায় এই অঞ্চল রাজনৈতিক ভাবে সমতটের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টিয় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার গুনাইঘর নামক গ্রাম থেকে বৈন্যগুপ্তের একটি তাম্রফলক পাওয়া গিয়েছে, যা খুব সম্ভবত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয় যেখানে একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপনের উল্লেখ পায়।[১৫] তাছাড়া কুমিল্লা অঞ্চলের ময়নামতি লালমাই অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ প্রত্ন অবশেষ যথা শালবন বিহার, আনন্দবিহার, কুটিলামুড়া, রূপবান মুড়া ইত্যাদি উক্ত অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষী বহন করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায় যে নরসিংদী জেলার উত্তারাঞ্চলও সুপ্রাচীন। এখানকার উয়ারী এবং বটেশ্বর নামক স্থানে সাম্প্রতিক বহু প্রত্নসামগ্রি পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ভূমির চর্চার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

দক্ষিণ পশ্চিমের প্রবীণ ভূ-ভাগ রাজমহলের দক্ষিণ থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলেই প্রাচীন বাংলার জনপদ রাঢ়, বজ্রভুমি, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল যা শশাঙ্কের সময় দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল।[১৬] রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম-সিংভূম-ধলভূমের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি প্রদেশ এই সুগঠিত পুরাতন ভূভাগের অন্তর্গত। তবে বর্তমান পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বাকুঁড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের[১৭] উচ্চতর লালমাটি অঞ্চল এই পুরাতন ভূ-ভাগের অন্তর্গত।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবাংলার দখিণাঞ্চলের এই পুরা ভূভাগের প্রায় সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই প্রাচীন রাঢ়দেশ নামে পরিচিত, যার পূর্ব সীমা ভাগীরথী, পশ্চিম সীমা রাজমহল ও দক্ষিণ সীমা সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত। প্রাচীন সাহিত্য, লিপিমালা ও অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায় যে এই রাঢ়দেশ ব্রহ্ম ও সুহ্ম নামক দুটি উপবিভাগে বিভক্ত ছিল এবং আরও পরবর্তীকালে তা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিতি লাভ করে।

উপরিউক্ত রাঢ়দেশের প্রশাসনিক বিভাগ গুলি হল- কঙ্কগ্রামভুক্তি,[১৮] বর্ধমানভুক্তি[১৯] ও দন্ডভুক্তি।[২০] রাঢ়দেশেও যে বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ভূমি তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় সেই অঞ্চলে প্রাপ্ত একাধিক বৌদ্ধ পুরাবশেষ থেকে। হিউয়েন সাঙ্গ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা বিহার যেটি বর্তমান মুর্শিদাবাদের চিরুটিতে অবস্থিত সেটিও যে রাঢ়দেশের অন্তর্গত তা ভৌগোলিক ভাবে প্রমাণিত। অন্যদিকে হিউয়েন সাঙ্গ বর্ণিত তাম্রলিপ্তর ১০ টি বৌদ্ধবিহার দক্ষিণ রাঢ়ের কোন অঞ্চলে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে, যদিও মোগলমারি বৌদ্ধবিহারটি হিউয়েন সাঙ্গ দ্বারা উল্লেখিত ১০ টি বিহারের মধ্যেই উল্লেখিত একটি তা একপ্রকার নিশ্চিত, যা বর্তমান পূর্ব মেদিনিপুর জেলার দাঁতনে অবস্থিত। অন্য দিকে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অন্তর্গত ভরতপুরেও (বুদবুদ থানা, পূর্ব বর্ধমান) একটি বৌদ্ধবিহারের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে যেটিও রাঢ়দেশের বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ভুমির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষাই আছে।

২) অপেক্ষাকৃত নবীন ভূভাগ :

ভৌগোলিক ভাবে এই অঞ্চলের ভূভাগ আলোচনার দাবি রাখলেও রাজনৈতিক ভাবে এই অঞ্চল সর্বদায় পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যা উপরের পঙক্তিগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাই শুধুমাত্র এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি আলোচনা এই অণুচ্ছেদের উল্লেখযোগ্য বিষয়। ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ, লালমাই, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সীমান্তবর্তী সমতলভূমিই হল নবীন ভূভাগ। এটি প্লাইস্টোসিন যুগের পাললিক অঞ্চল এখানকার মাটি লাল, স্থূল ও বালুময় তবে আংশিক সমতল প্রকৃতির। বরেন্দ্রভুমি, মধুপুরগড়, সুরমা-কুমিল্লা ও লালমাই-চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী ভূভাগ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ। আসলে উক্ত প্রথম দুটি অঞ্চল যথা- বরেন্দ্রভুমি, মধুপুরগড় রাজনৈতিকভাবে আদি-মধ্যকালীন বরেন্দ্রি বা পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত এবং সুরমা-কুমিল্লা ও লালমাই-চট্টগ্রাম সমতত-হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এক কথায়

বললে পুরাভুমি ও অপেক্ষাকৃত নতুন ভূমি ভৌগোলিক ভাবে আলাদা হলেও রাজনৈতিক ভাবে সবসময় হয় পুণ্ড্রবর্ধন নতুবা সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩) ব-দ্বীপ :

পশ্চিম-উত্তর ও পূর্বদিকে সীমান্তবর্তী পর্বতমালা ব্যতীত বাকি সমগ্র ভূভাগই নদীমালার ব-দ্বীপ বা ডেলটা বলে পরিচিত। ভূতত্ত্ববিদরা গাঙ্গেয় বদ্বীপকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন যথা- Moribund Delta (মৃত প্রায় ব-দ্বীপ), Mature Delta (পরিণত ব-দ্বীপ) and Active Delta (সক্রিয় ব-দ্বীপ)।[২১] Moribund Delta বলতে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, খুলনা ও যশোর অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে, Mature Delta বলতে ২৪ পরগণা, খুলনা ও যশোরেরে দক্ষিণাঞ্চল এবং Active Delta বলতে সুন্দরবন, বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও সন্দীপ ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল কে নির্দেশ করা হয়েছে।[২২] সুতরং সাধারণভাবে বলা যেতেই পারে যে, উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে ভাগীরাথী, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত ভূ-ভাগ মূলত প্লাবন সমভূমি এবং ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা দ্বারা গঠিত ব-দ্বীপ বা ডেলটা। যাইহোক আজকের পাদ্মা-ভাগীরাথী-মাধুমাতি দ্বারা সৃষ্ট সমভূমি অঞ্চলই যে বর্তমান ব-দ্বীপ এর ভূ-ভাগ তা বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য এবং লিপিমালা দ্বারাও সমর্থিত। নদিয়া, যশোর, খুলনা এবং ২৪ পরগণা এই ভূ-ভাগেরেই অংশ যা প্রাচীন সাহিত্যে 'খারিমন্ডল,[২৩] ব্যাঘ্রতটিমন্ডল,[২৪] ও নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চল সমতট'[২৫] অঞ্চল বলে উল্লেখিত। ৬ষ্ঠ শতকের কোটালিপাড়া তাম্রপট্টে 'নব্যবকাসিকা' নামক মন্ডলের উল্লেখ পায় যা বর্তমান বাখরগঞ্জ ও বরিশাল জেলা বলে প্রমাণিত, এই সমস্ত অঞ্চলই বর্তমান বদ্বীপ ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত। যদিও এই অঞ্চলে খুব একটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় না তৎসত্ত্বেও কয়েকটি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যেতেই পারে। যথা- বল্লালঢিপি (মায়াপুরের নিকট, নদিয়া), বালান্দা (গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগণা), চন্দ্রকেতুগড় (বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগণা) ও কঙ্কনদীঘি (সুন্দরবন অঞ্চল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা) ইত্যাদি কেন্দ্রগুলিতে যেসমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তা আংশিক ভাবে হলেও বঙ্গীয় বদ্বীপের বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক ভূমির নিদর্শন বহন করে।

পরিশেষে সার্বিকভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে বঙ্গীয় ভূখণ্ড সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আছে। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে, বুদ্ধের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে প্রচার পেতে শুরু করেছিল এবং মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এবং এই অনুমান খুব একটা অস্বীকার যোগ্য নয় ও ঐতিহাসিক মহলেও স্বীকৃত। আবার হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে প্রায় সমগ্র বঙ্গে অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধধর্ম তার ভীত শক্ত করেনিয়েছিল এবং পরবর্তী কালে পালরাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম তার চূড়ান্তর পরিণতি পেয়েছিল। অন্য দিকে বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে অর্থাৎ প্রাচীন সমতট ও হরিকেল অঞ্চলেও খ্রিস্টীয় ৭ম থেকে ৯ম শতকের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন রাজাদের পৃষ্টপোষকতা লাভ করে এবং খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তার ধর্মীয় অস্তিত বজায় রাখতে সার্থক হয়। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে অশোক পূর্ববর্তী বা অশোকের (খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক) সময় থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক এই ১৫০০ বছর বৌদ্ধধর্ম বাংলা কে তার ধর্মীয় ছত্রছায়ায় রাখতে সার্থক হয়েছিল তা স্বীকার করতে খুব একটা অসুবিধায় থাকার কথা নয়।

ইতিহসের পটভূমিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানব ভূগোলের একটি জটিল সংমিশ্রণ আর এই সংমিশ্রণকেই একটি নির্দিষ্ট ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াসই এই নিবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়। আর ধর্মের উপস্থিতি সেই ভৌগোলিক অবস্থান কে এক নতুন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষাপটের জন্ম দেয়, যেখানে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বীজ নিহিত থাকে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি প্রাচীন বঙ্গের ভূগোলকে এক নতুন পরিমণ্ডল প্রদান করেছে। যেমন কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নামহীন বা অপরিচিত থাকলেও সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে সেই ভূভাগ শুধুমাত্র আঞ্চলিক স্তরেই নয় বৃহৎ ভৌগোলিক স্তরেও পরিচয়ও লাভ করে। যেমন- বোধগয়া ও নালন্দা বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমি হওয়ার পূর্বে নামগন্ধহীন স্থান ছিল বা তার ভৌগোলিক অস্তিত্বের কথা এক সময় অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় স্থান দুটি শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাবে নয় বরং বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং নিজ দেশের বাহিরেও ধর্মীয় ও ভৌগোলিক পরিচিতি পেতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল, মানব ভূগোল ও ধর্মীয় ভূগোলের জটিল অথচ পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরার প্রয়াস করাই এই গবেষণামূলক নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

তথ্যসুত্র :

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *ডিসকভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজম* ইন বেঙ্গল, ক্যালকাটা: হরি প্রেস, ১৮৯৭, পৃ. ভূমিকা অংশ

২. আব্দুল মমিন চৌধুরী, 'হাজার বছরের পুরাতন বাঙালী: প্রাচীন বাংলার ব্যক্তিত্ব'- *সুন্দরম*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৯৫. পৃ. ১-৮

৩. আহমেদ হাসান দানি, 'ইন্ডিভিজুয়াল অফ বেঙ্গল আর্ট', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট*, খণ্ড ২, ঢাকা: ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট, ১৯৯৭, পৃ. ৯-১৬

৪. মহম্মদ হারুনুর রশিদ, 'দ্য জিওগ্রাফিক্যাল ব্যগ্রাওন্ড টু দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ সাউথ বেঙ্গল', *জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, খণ্ড ২৪-২৬, ১৯৭৯-৮১, পৃ. ১৫৯-১৭৮*

৫. অমিতাভ ভট্টাচার্য, হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ এন্সিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মিডিয়েভেল বেঙ্গল, কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭

৬. ব্যারি এম. মরিসন, *পলিটিক্যাল সেন্টারস অ্যান্ড কালচারাল রিজিয়নস ইন আর্লি বেঙ্গল*, টুকশন: দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজনা প্রেস, ১৯৭০, পৃ. ৮

৭. এফ. কিলহর্ন, 'খালিমপুর কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ ধর্মপাল', *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, খণ্ড ৪, ১৯৭৯, পৃ. ২৪৩-৫৪

৮. আর. মুখার্জি এবং এস. কে. মাইতি, *কর্পাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল*, ক্যালকাটা: ফির্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭

৯. তদেব, পৃ. ২৯৫

১০. তদেব, পৃ. ২৭৭

১১. আর. জি. বসাক, দ্য ফাইভ দামদরপুর কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ দ্য গুপ্তা পিরিয়ড, *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, খণ্ড ১৫, ১৯৮২, পৃ. ১৩১

১৩. বি. বসাক, 'ধনাইদহ কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ দ্য টাইম অফ কুমারগুপ্ত I: দ্য ইয়ার ১১৮', *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, খণ্ড ১৭, ১৯২৩-২৪, পৃ. ৩৪৫

১৪. কে. এন. দীক্ষিত, পাহাড়পুর কপারপ্লেট গ্রান্ট অফ দ্য {গুপ্ত} ইয়ার ১৫৯,

১৫. মুখার্জি এবং মাইতি প্রাগুক্ত, ৬৫

১৬. রিও সুকে ফুরুই, 'পাঞ্চরোল (এগরা) কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ দ্য টাইম অফ সসাঙ্ক: আ রি-এডিশন', *প্রত্ন সমীক্ষা* নিউ সিরিজ, খণ্ড ২, কোলকাতা: সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০১১, পৃ. ১১৯-৩০

১৭. এস. আর দাস, *অ্যান ইন্টেরিম রিপোর্ট অন এক্সক্যাভেশন অ্যাট রাজবাড়ীডাঙ্গা অ্যান্ড টেরাকোটা সিলস অ্যান্ড সিলিংস*, ক্যালকাটা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

১৮. ডি. সি. গাঙ্গুলি, 'শক্তিপুর কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ লক্ষণসেন', *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, খণ্ড ২১, ১৯৩১-৩২, প্র. ২১১

১৯. এন. জি. মজুমদার, 'মল্লসুরুল কপারপ্লেট অফ বিজয় সেন', *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, খণ্ড ২৩, ১৯৪০,

পৃ. ১৫৫
২০. ফুরুই প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-৩০
২১. রুপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, *দ্য আর্কিওলজি অফ কোস্টাল বেঙ্গল*, নিউ দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ১৯-২৫
২৩. মুখার্জি এবং মাইতি, প্রাগুক্ত, ২৯০
২৪. মুখার্জি এবং মাইতি, প্রাগুক্ত, ৯৫
২৫. স্যামুয়েল বিল, *বুদ্ধিস্ট রেকর্ড অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড*, খণ্ড ২, নিউ দিল্লি: মতিলাল বানারসিদাস, ১৯৮১, পৃ. ১৯৪, ১৯৯-২০১